বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকখাতে নারী ও শিশু

মুক্তি মণ্ডল

> মাঝেমাঝেই আমার বুকে ব্যথা হয়, একইসাথে বিরক্তিকর কাশি ও ফুসফুসে সমস্যা দেখা দেয়ার পর আমি ভারতে চিকিৎসা করাতে যাই, ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি ধূমপান করো? আমি বলি, না। তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথায় কাজ করো? আমি বলি, জর্দা ফ্যাক্টরিতে। তিনি খুব সাবলীলভাবে আমাকে বলেন, তাহলে তো তুই ডাইরেক্ট তামাক খাস!' *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবস্থাপক, জর্দা ফ্যাক্টরি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।*

সম্প্রতি কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার জর্দা ফ্যাক্টরিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা বিষয়ে মাঠকর্মভিত্তিক একটি গবেষণাকাজ করতে গিয়ে ফ্যাক্টরির কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত একজন ব্যবস্থাপকের সাথে আলাপ করছিলাম। আলাপের সময় তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে উপরে বর্ণিত কথাগুলো বলেন। তাঁর ভাষ্যের মাধ্যমে যে তথ্য আমরা পাই তাতে বোঝা যাচ্ছে জর্দা ফ্যাক্টরিতে যাঁরা শ্রমিকের কাজ করছেন সরাসরি তামাকচূর্ণ পরিবেশে, তাঁদের কর্মকাণ্ড যাঁরা তদারকি করছেন, তাঁরাও নিরাপদ নন। তাঁরাও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। আর যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জর্দা ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ধাপের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাঁরা যে স্বাস্থ্যঝুঁকির গভীর খাদের মধ্যেই নিমজ্জিত তা ব্যবস্থাপকের ভাষ্যেই প্রমাণিত! এ তথ্য থেকে আরো একটা ভয়াবহ দিকের মুখোশ উন্মোচিত হয় যে, যাঁরা এ পণ্য নিয়মিতভাবে সেবন করছেন, তাঁরা সবচে' মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্দরমহলে বাস করছেন। মৃত্যু প্রহেলিকা তাঁদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত তাঁদের অলক্ষ্যেই।

সারা বিশ্বেই ধোঁয়াবিহীন তামাক কোম্পানিগুলো নানাবিধ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে এরকম মৃত্যুপুরী তৈরিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ধোঁয়াবিহীন তামাক[৩] ব্যবহারের মাত্রা ও বৈচিত্র্য পর্যালোচনালব্ধ তথ্যে উঠে এসেছে যে, এর ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। এ খাতের উৎপাদকগণ শ্রেণিগত এবং রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামোর পরিসরে তাঁদের দাপট

[৩] ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ যখন প্রণীত হয় তখনো ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যকে অসংজ্ঞায়িত রাখা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে উক্ত আইনটি যখন সংশোধিত আকারে পাস হয় তখন ধোঁয়াবিহীন তামাককে তামাকজাত দ্রব্যের অন্তর্গত করে নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং উক্ত সংজ্ঞাতেই উল্লিখিত যে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের অন্তর্গত হলো গুল, জর্দা, খৈনী ও সাদাপাতা; যা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করে, কেউ কেউ শ্বাসের সাথে টেনে নেয়, দাঁতের ফাঁকে, মাড়ীর ফাঁকে এবং চামড়ার সাথে লাগিয়ে রাখে। এসব দ্রব্য না পুড়িয়ে মুখে অথবা নাকে ব্যবহার করা হয়। মুখে সেবনীয় ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য মুখের মধ্যে দাঁত ও মাড়ীর ফাঁকে ব্যবহার করা হয়। তামাক গুড়া নাকে শুঁকেও গন্ধ নেওয়া হয়।

আছে। যে কারণে তাঁরা নির্ভয়ে জনস্বাস্থ্যকে ভূলুণ্ঠিত-বিধ্বস্ত করা এই ক্ষতিকর পণ্যকে সুকৌশলে অতি মনোহর এবং সুগন্ধীযুক্ত পণ্যে রূপান্তর করে বাজারজাত করছে। ক্রেতাগণও আকৃষ্ট হচ্ছে বাজারজাতকরণে উৎপাদকগণের ব্যবহৃত নানাবিধ বাণিজ্যিক ফন্দি-কৌশলে। এর ফলে সেবনকারীর সংখ্যাও দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে এবং সার্বিকভাবে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি প্রবণতাও বাড়ছে। বাড়ছে মানুষের স্বাস্থ্যব্যয় ও কর্মক্ষম নারী-পুরুষের অকালমৃত্যুর রেখাচিত্রের ঊর্ধ্বমুখী বাঁক।

বর্তমানে সারাবিশ্বে ৭০টি দেশে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীর সংখ্যা ৩০ কোটির কোটা ছাড়িয়েছে। আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর তথ্য হলো এসব সেবনকারীর ৮৯ শতাংশের বাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। প্রায় ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারী নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বাস করেন। সারাবিশ্বে বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভারতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীর বাস[৪]। এই তিন দেশে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীর সংখ্যা ২৫ কোটি ৯০ লক্ষ, যা বিশ্বের মোট ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর ৮৬ শতাংশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ এজন্যই সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকির ভিতর রয়েছে। এ অঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষের বিশাল একটি অংশ ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করেন। বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনে আড়াই লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর মধ্যে ভারতেই মারা যায় ৬০ হাজারের বেশি। ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনে ১০ লাখের বেশি মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে[৫]।

বাংলাদেশে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করেন (শতকরা ২৭.২%)। এর মধ্যে নারী ১ কোটি ৩৪ লক্ষ (২৮%) এবং পুরুষ ১ কোটি ২৫ লক্ষ[৬] (পুরুষ ২৬%)। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-র ওয়েবসাইট কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। সে অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক ২৯.৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৩.৬ শতাংশ নারী ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করেন, নারী পুরুষ উভয়ের শতকরা হার ৩১.৭ শতাংশ[৭]। ২০০৯-এর গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভের প্রতিবেদনে এ পণ্য সেবনকারীর যে সংখ্যা দেখানো হয়েছিল এ সংখ্যা তার থেকে বেশি। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকেও সমর্থন মেলে যে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীর সংখ্যা বাড়ছে[৮]।

মূলত বাংলাদেশে তামাকজনিত মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র বর্তমানে একটা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০০৯ অনুসারে বাংলাদেশে ৪ কোটি ১৩ লাখ (৪৩%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক সেবন করে। আর পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয় প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যকার প্রায় ৪ কোটি ৩০ লাখ মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে মারা যায় ৫৭,০০০ জন মানুষ, পঙ্গুত্ব বরণ করে আরো ৩,৮২,০০০

---

[৪] National Cancer Institute and Centers for Disease Control and Prevention. *Smokeless Tobacco and Public Health: A Global Perspective*. Bethesda, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention and National Institutes of Health, National Cancer Institute. NIH Publication No. 14-7983; 2014.

[৫] http://www.kalerkantho.com/print-edition/deshe-deshe/2015/08/23/259639/print#sthash.TseoWk3f.dpuf

[৬] গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে : বাংলাদেশ রিপোর্ট, ২০০৯।

[৭] Non-Communicable Disease Risk Factor Survey, 2010; National ages. http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/bgd.pdf?ua=1

[৮] http://www.thefinancialexpress-bd.com/2015/05/15/92723

জন। তামাকের এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার ২০১৪-'১৫ অর্থবছরের বাজেটে প্রথমবারের মতো তামাকপণ্যে ১ শতাংশ হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ এবং এ উৎস থেকে অর্জিত অর্থ 'তামাকজনিত রোগ নিরাময়ের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে' ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদান করেছে।

এ পরিস্থিতির পরিধি আরো বাড়িয়ে তুলছে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের ব্যবহার। পৃথিবীর অনেক দেশেই ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন ও ব্যবহারকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় না। এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সবাই পরিমিত জ্ঞানও রাখেন না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈধতার কারণে এ পণ্যের বহুমাত্রিক ব্যবহার দিনকে দিন বাড়ছেই। এর শেকড় প্রোথিত আছে আমাদের সমাজ বাস্তবতার ভেতরেই। ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের সামাজিক সম্মতি আছে, যা সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও সুপরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় (এমনকি নগরকেন্দ্রিক নাগরিক সমাজেও) ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ হিসেবে পরিচিত, এটা সামাজিক আপ্যায়ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। এ জন্যই সমাজের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নে ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও বৈধ। এ কারণেই গণসমাবেশে প্রকাশ্যেই পানের সাথে জর্দা এবং গুল সেবনের রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সামাজিক এসব উৎসব-অনুষ্ঠানে ধোঁয়াবিহীন তামাকের বৈচিত্র্যপূর্ণ (তামাকের সাথে নানা ধরনের মিশ্রণ ব্যবহার করে তৈরি করা হয় বিচিত্র সব মনোহর ও সুগন্ধীযুক্ত তামাক) ব্যবহার লক্ষণীয়। সব বয়সী নারী-পুরুষই সামাজিক অনুষ্ঠানে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করতে পারে। এসব সামাজিক অনুষ্ঠানে কম-বয়সী নারী বা পুরুষ ধূমপান করলে তারা সামাজিকভাবে ধিকৃত হলেও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং এ জন্য সামাজিকভাবে ধিকৃত হতে হয় না। ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনে সামাজিক স্বীকৃতির ফলে এটার যে বহুমাত্রিক ক্ষতিকর দিক আছে সে বিষয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর নিম্ন ও গরিব শ্রেণির মানুষ পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল থাকে না এবং এ কারণে এতদিন ক্ষতিকর এই পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাসকরণে রাষ্ট্রীয় তড়িৎ তৎপরতাও উপেক্ষিত ছিল। তবে এ ধরনের চিত্রে ধীরে ধীরে হলেও পরিবর্তন আসছে।

তামাকের ভয়াবহতা বিবেচনা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে এফসিটিসিতে স্বাক্ষর করে। এর আলোকে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা কার্যকর করা হয়। অতি সম্প্রতি সরকার ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১৬৯টি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে এফসিটিসি বাস্তবায়ন অন্যতম (৩এ)। সদ্য প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। Tackling Tobacco Related Burden বা 'তামাক সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা' শীর্ষক শিরোনামে বলা হয়েছে—

> জনস্বাস্থ্য, সমাজ, পরিবেশ ও অর্থনীতিতে তামাকের ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় এসডিজি ৩-এর প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকার বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং একইসাথে এফসিটিসির অধিকতর প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

এরূপ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্যের ওপর তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি তহবিল গঠন আশু প্রয়োজন এবং সেই সাথে এই তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রায়োগিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাও খুব জরুরি। তা না হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সুষমভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য তৈরি করার সময় বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এক এক ধাপে এক এক ধরনের শ্রম ও শ্রমিক নিয়োজিত থাকে। তামাক পাতা শুকানো, প্রক্রিয়াকরণ করা, তামাকের পাতা গুড়া করা, তামাকের গুড়ার সাথে কেমিক্যাল মেশানো, মোড়ক তৈরি করা এবং কৌটায় তামাক ভরা ইত্যাদি কাজগুলো করতে হয়। এসব কাজ সম্পন্ন হয় অস্বাস্থ্যকর ও খুবই নোংরা পরিবেশে। পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, জর্দা ফ্যাক্টরির ভিতরকার পরিবেশ অত্যন্ত ভয়াবহ। যেকোনো জর্দা ফ্যাক্টরিতে ঢুকলে প্রথমেই তামাকের তীব্র গন্ধ ও ঝাঁঝ এসে লাগে নাকে। মুহূর্তের ভেতর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে তামাকপাতা গুড়া করা কটু গন্ধ ও তীব্র ঝাঁঝ। এর ফলে গা গুলিয়ে ওঠে। শরীর ঝিমঝিম করে। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং দম নিতে কষ্ট হয়। যে কেউ প্রথমবার জর্দা ফ্যাক্টরিতে ঢুকলে তিনি কাশতে বাধ্য হবেন। যারা জর্দা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে তাদের শরীরে প্রবেশ করে অনেক ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ এবং এর ফলেই শ্রমিকদের ফুসফুসের রোগসহ পাকস্থলিতে ঘা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও হৃদরোগজনিত শারীরিক সমস্যা এবং শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতেও ব্যাঘাত ঘটায়। উপরে বর্ণিত জর্দা ফ্যাক্টরির একজন ব্যবস্থাপকের বক্তব্যেও জর্দা ফ্যাক্টরিতে কাজ করার ক্ষতিকর চিত্রের সত্যতা উঠে এসেছে।

আইন অনুযায়ী জর্দা ফ্যাক্টরিতে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী,

> রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশু অধিকার রক্ষা করবে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম অর্থাৎ শিশুর স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর অথবা ব্যাঘাত ঘটায় অথবা বিপদের আশঙ্কা আছে এমন সব কাজে যেন শিশুদের ব্যবহার করা না হয় তার ব্যবস্থা নেবে।

উক্ত সনদের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার শিশুদের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করে একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে। এ তালিকার চতুর্থ নম্বরেই পেশার ধরন বা ক্ষেত্র হিসেবে রয়েছে বিড়ি ও সিগারেট তৈরির কাজ, যদিও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে সন্নিবেশিত কাজগুলো হলো :

ক. তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা;
খ. বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরি করা;
গ. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা;
ঘ. তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং
ঙ. শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একনাগাড়ে ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহণ করা।

জর্দা ফ্যাক্টরিতে যে কাজগুলো সম্পাদিত হয় তা উল্লিখিত কাজের আওতার মধ্যেই পড়ে। এ কারণেই বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৪০-এর উপ-ধারা (৩)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার তামাক পাতা শুকানো, প্রক্রিয়াকরণ করা, তামাকের পাতা গুড়া করা, প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল মেশানোর কাজগুলোকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে[৯]। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ অনুযায়ী শ্রমনীতির উদ্দেশ্যের ১০টি পয়েন্টের একটি হলো : সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুযায়ী বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ[১০]। কিন্তু আইন লঙ্ঘন/অমান্য করে প্রশাসনের নাকের ডগায় ধোঁয়াবিহীন তামাক কারখানাগুলোতে শিশুদের দিয়ে উপর্যুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করানো হচ্ছে। এ ধরনের কাজ মানুষের চোখের সামনে ঘটে চলেছে। দেখভাল করার কেউ নেই। নেই কোনো পরিবীক্ষণের ব্যবস্থাও। এসব কারণে ধোঁয়াবিহীন তামাক ফ্যাক্টরির মালিকরাও নির্দ্বিধায় ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ফুলেফেঁপে উঠছে তাদের অর্থ-সম্পদ। ব্যবসায়ীদের অর্থ-সম্পদের পরিমাণ যত বাড়ছে ততই ঝুঁকির ভিতর পতিত হচ্ছে হাজারো নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য। ব্যয় বাড়ছে স্বাস্থ্যখাতে এবং বহুমানুষের শ্রমঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতিতে যুক্ত হচ্ছে ঝুঁকি-প্রবণতা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর তথ্য অনুসারে (২০১২) মূল্য সংযোজন করের (ভ্যাট) আওতায় নিবন্ধিত জর্দা ফ্যাক্টরির সংখ্যা ৩১২টি এবং গুল ফ্যাক্টরির সংখ্যা ৬০টি। এ খাতে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যার কোনো সঠিক হিসেব কোথাও নেই। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেশের ৩৮টি জেলায় ১৪৬টি জর্দা (১২৩টি) এবং গুল (২৩টি) ফ্যাক্টরিতে ৩৪৪৩ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৯৪ জন শিশুশ্রমিক (ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য— জর্দা ও গুল উৎপাদন, তাবিনাজ, ২০১৪)। উক্ত গবেষণার চিত্র সারাদেশের সার্বিক চিত্র না হলেও ধোঁয়াবিহীন তামাক ফ্যাক্টরি এবং এসব ফ্যাক্টরিতে নিয়োজিত শ্রমিকরা যে অস্বাস্থ্যকর ও ভীতিকর পরিবেশে কাজ করে, সে বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। জর্দা ও গুল ফ্যাক্টরির ভিতরকার কদাকর চিত্রের খণ্ডাংশ যতটুকু প্রকাশিত তাতেই আমরা বুঝতে পারি যে, এসব ফ্যাক্টরির পরিবেশ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্যে বিশেষ করে শিশু ও নারীশ্রমিকদের জন্য ভয়াবহ, ভীতিকর এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

এ ছাড়া, অনিবন্ধিত ও অনিয়ন্ত্রিত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল ও জর্দা ফ্যাক্টরি দেশের আনাচে কানাচে প্রকাশ্যে এবং গোপনে পরিচালিত হচ্ছে। পারিবারিক পর্যায়েও কিছু কিছু জর্দা ও গুল ফ্যাক্টরিতে জর্দা ও গুল উৎপাদিত হচ্ছে। কী পরিমাণ জর্দা মাসিক ও বাৎসরিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে ফ্যাক্টরিগুলোতে সে বিষয়ে সঠিক তথ্য ঘাটতির কারণে এ খাতের ব্যাপ্তি ও ক্ষতির সার্বিক চিত্র পর্যালোচনায় সঠিকভাবে উঠে আসে না। যে কারণে নীতি নির্ধারণী কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে এ খাতের সার্বিক চিত্র সম্পর্কে ভালোভাবে পরামর্শ দেওয়াও দুষ্কর হয়ে ওঠে। সুধী মহলের সবাই জানে যে, ধোঁয়াবিহীন তামাক ফ্যাক্টরিতে শিশু এবং নারীরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু ধোঁয়াবিহীন তামাক বিশেষ করে জর্দা ফ্যাক্টরির অন্দরমহলে শিশু ও নারীরা যে কীরকম ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে, সে বিষয়ে কারো বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন নেই। সে কারণেই জর্দা ফ্যাক্টরিতে নারী ও শিশুশ্রমের সার্বিক চিত্র কীরকম, একই সাথে নারীশ্রমিকদের অবস্থাও কীরকম সে বিষয়ে জানা ও বোঝার জন্য

[৯] বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

[১০] বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩

একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে ভেড়ামারা উপজেলায় চালু জর্দা ফ্যাক্টরির কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, ফ্যাক্টরির শ্রমিক, এলাকার সুশীল ও রাজনীতিক এবং শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের (নারী-পুরুষ-শিশু) সাথে নিবিড়ভাবে কথা বলে ধোঁয়াবিহীন তামাকখাতের তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে সম্পূর্ণ গুণগত পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী যেসব এলাকায় তামাক চাষ বেশি হয় এবং আগে থেকেই যেসব এলাকায় বিশেষ করে বিড়ি ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে, সেসব এলাকাতেই ধোঁয়াবিহীন তামাক কারখানার/ফ্যাক্টরির (গুল-জর্দা) কার্যক্রম বেশি পরিলক্ষিত হয়। কারণ জর্দা ও গুলের প্রধান উপাদান তামাক আর তামাক উৎপাদন এলাকাতে কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যাওয়ার ফলে এসব এলাকায় জর্দা ও গুল ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর রংপুরের হারাগাছ, লালমনিরহাটসহ নীলফামারী, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর ও ভেড়ামারা, যশোর ও খুলনা অঞ্চলের বিড়ি ফ্যাক্টরি অধ্যুষিত এলাকাগুলো বর্তমানে গুল/জর্দা তৈরির আদর্শ স্থানে পরিণত হয়েছে। জর্দা ও গুলের চাহিদাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিড়ি খাতের উৎপাদনে শ্লথগতি ও চাহিদা পড়তির কারণে বিড়ি মালিকরা তড়িৎ লাভের আশায় গুল/জর্দা উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করছে। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর ও ভেড়ামারাতেও অনেক বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিক জর্দা উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় তামাক চাষ হচ্ছে এবং এসব তামাক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে স্থানীয় বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাক ফ্যাক্টরিতে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকেও তামাক নিয়ে আসেন ফ্যাক্টরি মালিকরা। স্থানীয় তামাকের কিছু ব্যবহৃত হয় ধোঁয়াবিহীন তামাক ও বিড়িখাতে এবং বাদবাকি দেশের অন্যান্য জায়গায় এখান থেকে তামাক জোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভেড়ামারা উপজেলায় বর্তমানে ১৪টা জর্দা ফ্যাক্টরি জর্দা উৎপাদনে নিয়োজিত আছে। এসব জর্দা ফ্যাক্টরির বেশির ভাগ ব্যবহৃত তামাকের জোগান আসে বৃহত্তর রংপুর এলাকা থেকে। এসব ফ্যাক্টরির কয়েকটির কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এই এলাকায় জর্দা ফ্যাক্টরির সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীশ্রমিক এবং অবৈধ শিশুশ্রমও। এই এলাকায় আগে থেকেই বিড়ি ফ্যাক্টরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই সাথে নব উদ্যমে শুরু হয়েছে জর্দা ফ্যাক্টরির কার্যক্রম। নিম্নে জর্দা ফ্যাক্টরির বিকাশের একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

জর্দা ফ্যাক্টরি বিকাশের একটি টাইমলাইন

সময়	উৎপাদনে নিয়োজিত জর্দা ফ্যাক্টরির সংখ্যা	
১৯৯০ পর্যন্ত	৩টি জর্দা ফ্যাক্টরি জর্দা উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল	বর্তমানে ১৪টি জর্দা ফ্যাক্টরির মধ্যে উপজেলা শহরের ভিতর ৮টি এবং শহরের বাইরে ৬টি উৎপাদনে নিয়োজিত আছে।
১৯৯১-২০০০	৮টি জর্দা ফ্যাক্টরি জর্দা উৎপাদনে আসে	
২০০১-২০১০	১৪টি জর্দা ফ্যাক্টরি জর্দা উৎপাদনে নিয়োজিত হয়	

এইসব জর্দা ফ্যাক্টরিতে বেশির ভাগ শ্রমিক আসে উপজেলা শহরের বাইরে থেকে। প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিক শহরের বাইরে থেকে এসে জর্দা ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজ করে। উপজেলার গোলাপ নগর, ধরমপুর, বিলসুখা, সাতবাড়ি এবং কোদালিয়া পাড়া থেকেই অধিকাংশ শ্রমিক জর্দা ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজ করতে আসে। শ্রমিকদের মধ্যে জর্দা ফ্যাক্টরিগুলোর প্রাণ হলো শিশু ও নারীশ্রমিকরা। এদের শ্রমমূল্য সস্তা এবং এদের সহজেই পাওয়া যায় বলে মালিকপক্ষ এদের বেশি পছন্দ করে।

একজন স্থানীয় ব্যক্তির ভাষ্য : 'ওর তো কিছুই ছিল না, জর্দা বেঁচেই অনেক বিল্ডিং করেছে' (ভেড়ামারার একটি জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকের উন্নতি দেখে)। এ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের তথ্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, একটি উপজেলাতেই (সৈয়দপুর) ছোট-বড়ো মিলে প্রায় ৩০টি গুল ফ্যাক্টরি বিদ্যামন। এখানে কাজ করে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক। এর ৯০ ভাগই নারী ও শিশুশ্রমিক। ৩-১৫ বৎসর বয়সী শিশুরাও এসব কারখানায় কাজ করে। চুক্তিভিত্তিক এই কাজে দৈনিক ১০০-১৫০ টাকা পর্যন্ত আয় হয়। ফ্যাক্টরির মালিকেরাও স্বীকার করেছে যে তাদের কারখানায় শিশুশ্রমিকরা কাজ করে।

বিড়িখাত নিয়ে মালিকরা তাদের নিয়োগকৃত গবেষক, লবিস্ট ও ফ্রন্টগ্রুপ দিয়ে যেমন ২৫ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে বলে অপপ্রচার চালায়, সেরকম কোনো তৎপরতা জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকদের নেই। কারণ এ খাত নিয়ে সরকারের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকরা খুব একটা সমস্যার সম্মুখীনও হন না। বিড়িখাত থেকে জর্দা ফ্যাক্টরির কাজ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ খাত নিয়ে কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ভেড়ামারা উপজেলায় বর্তমানে যে ১৪টি জর্দা ফ্যাক্টরি চালু আছে, তার মধ্যে প্রধানগুলো হলো জাকির, নিশান, কালাম, সজিব, রাকিব, রফিকুল এবং আবেদ জর্দা ফ্যাক্টরি। ১৪টি ফ্যাক্টরির মধ্যে ১০টি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জর্দা উৎপাদন করে এবং ৪টি উৎপাদন করে গৃহস্থালি পর্যায়ে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভেড়ামারার জর্দা ফ্যাক্টরিগুলোতে বার্ষিক উৎপাদিত হয় প্রায় ১৭২,৮০০,০০০ পিস জর্দার কৌটা। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ প্লাস্টিকের কৌটা এবং ২৫ শতাংশ টিনের কৌটা। প্লাস্টিকের কৌটা সাধারণত ১০ গ্রাম, ২৫ গ্রাম এবং ৩০ গ্রাম ওজনের মধ্যেই সীমিত রাখে ফ্যাক্টরিগুলো। এর মধ্যে ১০ গ্রামের কৌটা ৮৫ শতাংশ এবং বাদবাকি ২৫ এবং ৩০ গ্রামের কৌটা। টিনের কৌটা সাধারণত ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম এবং ১৫০ গ্রামের হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৫০ গ্রামের কৌটা ৭০ শতাংশ (প্রতি কৌটা ১৩ টাকা দাম), ১০০ গ্রামের কৌটা ২০ শতাংশ (প্রতি কৌটার দাম ৩৫-৫০ টাকা, এটার দাম কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে) এবং ১৫০ গ্রামের কৌটা ১০ শতাংশ (প্রতি কৌটার দাম ২০০-৫০০ টাকা, এই সাইজের কৌটার দামও কোয়ালিটির ওপর নির্ভরশীল)।

পারিবারিক পর্যায়ে পরিচালিত ৪টি জর্দা ফ্যাক্টরির বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৮,৬৪০,০০০ পিস কৌটা। একজন ব্যবস্থাপকের সাথে নিবিড়ভাবে আলাপের মাধ্যমে জানা গেছে যে, জর্দা ফ্যাক্টরিগুলো মোট উৎপাদনের ৫৫ শতাংশের ট্যাক্স প্রদান করে থাকে, বাকি ৪৫ শতাংশের কোনো ট্যাক্স প্রদান করে না। একটু কম-বেশি করে এরকম চিত্র প্রায় প্রতিটি জর্দা ফ্যাক্টরিরই। কেন ৪৫ শতাংশ পণ্যের ট্যাক্স প্রদান করে না ফ্যাক্টরি মালিকরা? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, জর্দা ফ্যাক্টরিতে নিয়মিত আসেন কাস্টমসের কর্মকর্তারা, তাদের ঘুষ দিতে হয়। পণ্য বাজারজাতকরণে যাতে থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ বাধা না দেয়, সেজন্য তাদেরও ঘুষ দেয়া হয়। এ সব ঘুষের টাকা জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকরা

সংগ্রহ করে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে। বরং ঘুষ দিয়ে আরো অনেক বেশি টাকা লাভ হয় এই অবৈধ উপায় অবলম্বন করে। তাঁর মতে মোট টাকার (৫৫ শতাংশের ট্যাক্স প্রদান করে মালিক, এটাকেই এখানে মোট উৎপাদন ধরা হচ্ছে) ৫১ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হয় কাস্টমসের মাধ্যমে, বাকি ৪০ শতাংশ যায় কাস্টমসকে ঘুষ দিতে এবং ৪ শতাংশ যায় থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশকে ঘুষ দিতে। বাদ বাকি যা থাকে তা জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকের পকেটে ঢোকে। যারা এসব জর্দা ফ্যাক্টরি পরিচালনা করছেন, তারা সবাই রাজনৈতিকভাবে খুব প্রভাবশালী। তারপরও তাদের অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে ও ঘুষ দিতে হয়। ঘুষ না দিলে তারা ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন না।

জর্দা ফ্যাক্টরির দমবন্ধকর খুপরিতে কর্মরত নারীশ্রমিকরা

জর্দা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি মালিকদের প্রধান অবলম্বন মুদি দোকান এবং পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। জর্দাপণ্যের ৮০ শতাংশ মুদি দোকান এবং ২০ শতাংশ পানের দোকানের

মাধ্যমে বিক্রি হয়। পারিবারিক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্য পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই বাজারজাত করে। তাদের কোনো ডিলার বা বিক্রয় প্রতিনিধি নেই। অন্যদিকে, জর্দা ফ্যাক্টরিগুলোর নিজস্ব বিক্রয় প্রতিনিধি যেমন আছে, তেমনি তাদের নিয়োগকৃত ডিলারও আছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ৩০ শতাংশ পণ্য বিক্রি করে ডিলারের মাধমে এবং বাকি ৭০ শতাংশ বিক্রি করে নিজস্ব বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে।

জর্দা ফ্যাক্টরিগুলোতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে (তামাকপাতা মেশিনে গুড়া করা, রোদে শুকানো, কেমিক্যাল উপকরণসহ অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মেশানো, গুড়া তামাক কৌটায় ভরা, লেবেল লাগানো এবং প্যাকেটজাতকরণ) নিয়োজিত আছে প্রায় ৪০০ জন শ্রমিক (নারী-পুরুষ ও শিশু)। নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ শিশু এবং এসব শিশুশ্রমিকদের অধিকাংশের বয়স ৫-১৫ বছরের মধ্যে। বাকি ৭৫ শতাংশ শ্রমিকের মধ্যে ৬০ শতাংশ নারী এবং ১৫ শতাংশ পুরুষ। শ্রমিকদের ভিতর দুটি ভাগ আছে : ১. চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক— এরা সপ্তাহের ৭ দিনই কাজ করার চেষ্টা করে। মাসে বড়জোর গড়ে তিনদিন কাজে আসে না (যদি শরীর খারাপ থাকে) এবং ২. নিয়মিত শ্রমিক— এরা সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করে, এদের মাসে ৪ দিন ছুটি আছে ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে। এসব শ্রমিক দিয়েই মূলত মালিকরা তামাক গুড়া করার কাজগুলো করান। তামাকগুড়া বস্তায় ভরার কাজ করেন নারীশ্রমিকরা আর বস্তা টানার কাজ করেন পুরুষরা। এখানে শিশুরা কাজ করে না। নিয়মিত শ্রমিকদের আয়-উপার্জন ফ্যাক্টরি নির্ধারিত, যাতে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য করা হয়। নারীশ্রমিকরা প্রতিদিনের কাজের মজুরি পান ১০০ টাকা, যেখানে পুরুষরা পান ২০০ টাকা। নিয়মিত শ্রমিকরা সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কাজ করে।

'শিশুদের কচি ও নরম আঙুল জর্দার কৌটায় তামাক ভরা থেকে শুরু করে লেবেল লাগানো পর্যন্ত খুব দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে করতে পারে। এজন্য শিশুদের নিয়োগ দিতে পছন্দ করে জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকরা'— এটি ভেড়ামারা উপজেলার জর্দা ফ্যাক্টরির একজন ব্যবস্থাপকের বক্তব্য।

শিশুশ্রমিকদের কাজের মধ্যে আছে : কৌটায় গুড়া তামাক ভরা, লেবেল করা, প্যাকেজিং করা, প্যাকেট করা, ফয়েল করা (৬টা কৌটায় এক ফয়েল) এবং ব্রুস করা (১৪৪×২৫=এক ব্রুস)। শিশুশ্রমিকদের মধ্যে ১০ শতাংশ স্কুলে যায় এবং ৯০ শতাংশ কোনো লেখাপড়া জানে না। যে ১০ শতাংশ স্কুলে পড়ে তারা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। যত কাজ করবে ততই পয়সা বেশি আসবে, পরিবার সদস্যদের এরকম ভাবনার কারণেই শিশুদের বেশির ভাগ সময় জর্দা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হয়। জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষা শেষেও অনেক ছাত্র জর্দা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে আসে। তারাও উপরে উল্লিখিত কাজগুলোই সম্পাদন করে থাকে। একটি শিশু সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ১৪৪×২৫=৩৬০০ পিস জর্দার কৌটো তৈরির কাজ করতে পারে। এজন্য সে মজুরি পায় গড়ে ১২৫ টাকা। একটি শিশু মাসে গড়ে ২৫ দিন কাজ করতে পারে। সে হিসেবে শিশুশ্রমিকদের মজুরি হিসেবে আয় হয় ১২৫×২৫=৩১২৫ টাকা। যেসব শিশু জর্দা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তাদের শরীর ফ্যাকাশে। তাদের ত্বকও স্বাভাবিক নয়। বেশির ভাগ সময় এই শিশুরা বদ্ধ ঘরে তামাকের কটু গন্ধ ও ঝাঁঝের মধ্যে থাকে, সে কারণে তারা নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে। তারা কাশি, জ্বরজ্বর ভাব, গা ম্যাজম্যাজ করা, ঘনঘন হাই ওঠা এবং মাঝেমাঝে বুকে ব্যথা অনুভব করে।

শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের পরিবারের সার্বিক অবস্থা শোচনীয়। এদের পরিবার খুবই দরিদ্র শ্রেণির। পরিবারের বেশির ভাগ কর্মঠ বয়স্ক সদস্য কোনো কাজ করে না। কেউ কেউ কাজ করলেও তাদের নিয়মিত কাজ থাকে না। কিছু পরিবার আছে যেগুলো এই শিশুরাই টিকিয়ে রেখেছে। এই শিশুরা যদি কাজ না করে তবে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের না খেয়ে থাকতে হবে। যে কারণে তারা বাধ্য হয়েই জর্দা ফ্যাক্টরির ভয়ংকর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের পর দিন মরণপণ্য তৈরির কাজ করে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে পরিবারের অকর্মঠ ও বয়স্ক সদস্যদের বাঁচিয়ে রাখতে। যে বয়সে এসব কোমলমতি শিশুরা স্কুলে যাবে, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিবে, হয়ত-বা খোলা আকাশের নিচে দৌড়াদৌড়ি করবে, সেই বয়সেই শিশুরা জর্দা ফ্যাক্টরির গুমোট মরণফাঁদে আটকে আছে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে। সকাল থেকে রাত অবধি ওই দুর্গন্ধময় পরিবেশেই কচি প্রাণগুলো হলুদ-ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে।

এই শিশুদের পরিবারের সম্পদ নেই বললেই চলে। শরীরই তাদের একমাত্র সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেশির ভাগ পরিবারের শুধুই বসতভিটা আছে, আবাদি জমিজমা নেই। শ্রম বিক্রি করেই তাদের সংসার চলে। শিশুশ্রমে নিযুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে ৩০ শতাংশ পরিবার পুরোপুরি শিশুদের আয়ের ওপরই নির্ভরশীল। বাদ বাকিরা পরিবারের মোট আয়ে সাপোর্ট দিয়ে থাকে। যেসব পরিবার পুরোপুরি শিশুদের ওপর নির্ভরশীল, তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩-৪ জন। মাসে যে টাকা আয় (৩১২৫ টাকা) হয়, তা দিয়েই কোনোরকম টেনেটুনে তাদের সংসারটা চলে।

শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের যে আয়, তা ২০ বৎসর আগের খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ (১৯৯৫/৯৬)-এ একটি ভূমিহীন পরিবারের মাসিক গড় যে আয় ছিল (৪৩৬৬ টাকা) তার থেকেও অনেক কম। খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এর তথ্য অনুসারে (এইচআইইএস-২০১০) ২০১০ সালে একটি ভূমিহীন পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ১১,৪৭৯ টাকা, ২০০৫ সালে এটা ছিল ৭,২০৩ টাকা এবং ২০০০ সালে ছিল ৫,৮৪২ টাকা। গত ১৫-২০ বৎসরে প্রতিটি শ্রেণি/পেশার মানুষের মাসিক গড় আয় বেড়েছে দ্বিগুণ-তিনগুণ। কিন্তু সে তুলনায় জর্দা ফ্যাক্টরির শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের আয় বাড়ে নি বরং ২০ বৎসর আগেকার একটি ভূমিহীন পরিবারের গড় আয় থেকেও অনেক নিচে নেমে গেছে এদের মাসিক গড় আয়। নারীশ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এরকম দৃশ্যই পরিলক্ষিত। এসব পরিবারের শিশুরা বেড়ে ওঠার আগেই ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। পরিবারপ্রধানরা সংসার সামলাতে গিয়ে এসব সহজ-সরল শিশুদের ঠেলে দেন মরণফাঁদে। এসব শিশুর দৈহিক গড়ন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের শৈশব, কৈশোর বলে কিছুই থাকে না। শুধু কাজ করা আর অল্প একটু অন্ন জুটলেই এদের আর কিছু যেন চাওয়ার নেই।

একটি ঘটনা বিশ্লেষণ

হাকিমের বয়স ১৫। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে আছে। সে হতদরিদ্র সহায়-সম্বলহীন বয়স্ক মা-বাবার একমাত্র উপার্জনকারী রক্তমাংসের একটা ক্ষুদ্রমেশিন বললে ভুল হবে না। অভাবের কারণে সেই ৫ বৎসর বয়স থেকে সে জর্দা ফ্যাক্টরির গুমোট-অন্ধকারে কাজ করে টাকা আয় করা মাংস-মেশিনের ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কাজের বিকল্প তার জানা নেই। সংসারের পুরো বোঝা মাথায় নিয়ে তাই এই ছোট্ট শরীরই হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার শেষ সম্বল। বাবা এখন কোনো

কাজই করতে পারে না। মা সহজ-সরল গ্রাম্য গৃহিণী। এই বয়স্ক দম্পত্তির হাকিমই একমাত্র বেঁচে থাকার ভরসা।

প্রতিদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে তাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়। জর্দা ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ৭টার মধ্যে ফ্যাক্টরিতে পৌঁছাতে হয়। কাজ শেষে ফ্যাক্টরি থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রতিদিনই রাত হয়ে যায়। ক্লান্ত শরীর অবশ হয়ে থাকে। দিনের আলোর সবটুকু সময় তার কাটে জর্দা ফ্যাক্টরির বিভীষিকাময় তীব্র তামাকগন্ধে ভরা খুপরির মধ্যে। দিনের বেলা মানুষের পদচারণা কীরকম তা সে প্রায় ভুলেই গেছে। তার মাঝে মাঝে গা ব্যথা করে। গভীর রাতে যখন কাশি হয় তখন বুকে হালকা ব্যথা অনুভব করে। প্রায়ই শরীরে জ্বরজ্বর অনুভূতি হয়। তখন কাজ করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তবু কাজ করতেই হয়। কোনো উপায় নেই তার। তার মতো আরো যারা কাজ করে জর্দা ফ্যাক্টরিতে, তাদেরও তার মতোই অবস্থা। গতকালও সে হালকা জ্বর থাকা অবস্থায় ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিল। একদিন যদি সে ফ্যাক্টরিতে না যায় তাহলে সেইদিনের জন্য পরিবারের খরচ জোগান দেবার মতো পরিবারে অন্য কেউ নেই। যে কারণে সে কাজে যেতে বাধ্য হয়।

তহিদুল, রফিক, মাজেদা, রবি, দোলেনা, রজিনা, মাবিয়া এবং খুশির মতো আরো অনেক শিশু হামিমের মতোই বাধ্য হয়ে সংসারের বোঝা নিজেদের কাঁধে নিয়ে জর্দা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে। অভাবের সংসারকে কোনোরকমে টিকিয়ে রাখা চেষ্টা করছে।

সপ্তাহে ৬ দিন সে ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। দেড়-দুই কিলোমিটার পায়ে হেঁটেই সে কাজে যায়। গড়ে প্রতিদিন তার আয় হয় ১৫০ টাকার মতো। তার মাসিক আয় ৩৯০০ টাকা। এত অল্প টাকাতেই তিনজনের সংসার কোনোরকমে চলে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র এই শরীরটুকুই বাবা-মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কঠোর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত যে সে পড়ালেখা করেছিল তা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে।

হাকিম গত ১০ বৎসর যাবৎ জর্দা ফ্যাক্টরির অস্বাস্থ্যকর ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে যাচ্ছে। এখান থেকে সে কীভাবে বের হবে সে কৌশল তার জানা নেই। সে প্রতিদিন প্লাস্টিকের কৌটায় গুড়া তামাক ভরে, লেবেলিং করে, মোড়ক ও প্যাকেজিংয়ের কাজ করে। তারপর ফয়েল করার শেষে ব্রুস করার মাধ্যমে তার কাজ শেষ করে। এসব কাজ করেই দিন শেষে তার হাতে আসে গড়ে ১৫০ টাকা। এই অল্প কয়টা টাকাই টিকিয়ে রেখেছে হাকিমের অভাবে টলমলে ক্ষুদ্র সংসার।

নারী ও শিশু শ্রমিকরাই জর্দা ফ্যাক্টরির মূল চালিকাশক্তি। নারীশ্রমিকরা যথাযথ শ্রমের মূল্য পায় না। পুরুষের তুলনায় তাদের পারিশ্রমিক অনেক কম। এই অন্যায্য পরিস্থিতির বদল হওয়া দরকার। আর ফ্যাক্টরিতে কাজ আইনতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত। মালিকরা আইন লঙ্ঘন করে শিশুদের নিয়োগ দিচ্ছে এবং শিশুদের কম শ্রমমূল্যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে নিযুক্ত করে তাদের জীবনকে সংকটপূর্ণ করে তুলছে। এ অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে যে আইন আছে তা কার্যকরভাবে প্রতিপালন করতে পারলে এই ভয়াবহ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হবে।

মুক্তি মণ্ডল কবি ও গবেষক। প্রজ্ঞায় কর্মরত। mukte.mandal@gmail.com